সম্পাদকীয়

editorialamarbarta@gmail.com

নতুন রাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছা

জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠতে হবে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। জাতীয় সংসদে গত বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৩৪৩ জন ভোটারের মধ্যে ২৫৫ ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন এবং পরদিন বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। প্রায় ৩৫ বছর পর একাধিক প্রার্থীর অংশগ্রহণে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন হওয়া এ নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের পর দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হলেন। ছাত্ররাজনীতি, শিক্ষকতা, সরকারি চাকরি, স্থানীয় সরকার, সংসদ ও মন্ত্রিসভাড়বিভিন্ন পরিসরে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। দীর্ঘদিন তিনি বিএনপির মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দেশের রাজনীতির নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দলটির অন্যতম প্রধান মুখ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর নতুন দায়িত্বের প্রকৃতি তাঁর পূর্ববর্তী রাজনৈতিক পরিচয় থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। একজন রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিল দলীয় আদর্শ ও রাজনৈতিক অবস্থানকে এগিয়ে নেওয়া। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব হবে রাষ্ট্র, সংবিধান এবং সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা। এই রূপান্তর শুধু পদ পরিবর্তনের বিষয় নয়; এটি মানসিকতা, ভূমিকা ও দায়িত্বেরও পরিবর্তন। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ। রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম তাঁর নামেই পরিচালিত হয়। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্বাহী ক্ষমতা সীমিত হতে পারে, কিন্তু তাঁর সাংবিধানিক ও নৈতিক গুরুত্বকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত একটি সমাজে রাষ্ট্রপতির পদ মানুষের কাছে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। সেই কারণেই নতুন রাষ্ট্রপতির সামনে সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা হবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। তিনি বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেনড়এটি রাজনৈতিক বাস্তবতা। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর পরিচয় আর কোনো দলের নয়; তিনি সমগ্র প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি। সরকার, বিরোধী দল এবং সংসদের বাইরে থাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিড়সবাই যেন তাঁর মধ্যে নিরপেক্ষতা দেখতে পারে, সেটিই হওয়া উচিত তাঁর দায়িত্ব পালনের প্রধান মানদণ্ড। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন এবং রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তে তাঁর অবস্থান ও ভূমিকার মধ্য দিয়েই সেই নিরপেক্ষতার পরীক্ষা হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যখন আস্থার সংকট গভীর এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে, তখন রাষ্ট্রপতির আচরণ ও সিদ্ধান্তের প্রতি জনসাধারণের প্রত্যাশাও স্বাভাবিকভাবেই বেশি থাকবে। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে তাঁর জন্য সহায়ক হতে পারে। তিনি দেশের রাজনৈতিক সংঘাত, গণতান্ত্রিক সংকট এবং সাংবিধানিক বিতর্কের বিভিন্ন পর্যায় প্রত্যক্ষ করেছেন। রাষ্ট্রপতি মূলত রাষ্ট্রের অভিভাবক। অভিভাবকের দায়িত্ব কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা নয়; বরং সবার অধিকার, মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রতি সমান দায়িত্বশীল থাকা। তাঁর দরজা ও মনোযোগ সব রাজনৈতিক মত, সামাজিক গোষ্ঠী এবং নাগরিকের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে এমন আস্থা প্রতিষ্ঠা করাও তাঁর দায়িত্বের অংশ। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এমন এক সময়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছেন, যখন দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা এবং রাজনৈতিক বিভাজন কমানো অত্যন্ত জরুরি। তাঁর সামনে তাই সুযোগও আছে, চ্যালেঞ্জও আছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের পর তাঁর সবচেয়ে বড় পরীক্ষা এখন দলীয় রাজনীতির বাইরে দাঁড়িয়ে একজন সত্যিকার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা।

ছাত্ররাজনীতি, শিক্ষকতা, সরকারি চাকরি, স্থানীয় সরকার, সংসদ ও মন্ত্রিসভাড় বিভিন্ন পরিসরে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। দীর্ঘদিন তিনি বিএনপির মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দেশের রাজনীতির নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দলটির অন্যতম প্রধান মুখ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর নতুন দায়িত্বের প্রকৃতি তাঁর পূর্ববর্তী রাজনৈতিক পরিচয় থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। একজন রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিল দলীয় আদর্শ ও রাজনৈতিক অবস্থানকে এগিয়ে নেওয়া।

সন্তোষপুর ইকোপার্ক

বনাঞ্চল ও কৃষি উভয়ই রক্ষা করা হোক

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার সন্তোষপুরের প্রাকৃতিক শালবন ধ্বংসের ইতিহাস এ দেশের বন ধ্বংসের এক করুণ দলিল। একসময় যা ছিল সাড়ে তিন হাজার একরের বেশি বিস্তৃত এক গভীর অরণ্য, যেখানে বিচরণ করত বিভিন্ন বন্য প্রাণী। কালের বিবর্তনে মানুষের বসতি বিস্তার, অনিয়ন্ত্রিত চাষাবাদ ও দখলদারির কবলে পড়ে সেই প্রাকৃতিক শালবন আজ এসে ঠেকেছে মাত্র ৫০ একরে। সম্প্রতি এই বনাঞ্চলকে ইকোপার্ক ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বনাঞ্চলটি সংরক্ষণ প্রক্রিয়া টেকসই হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্প্রতি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের অধীনে এই বনাঞ্চলের ৫৬৫ একর এলাকাকে 'ইকোপার্ক' হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিলুপ্তপ্রায় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারে সরকারের এই সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে প্রশংসনীয় হলেও প্রকল্পটিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অধিবাসী ও কৃষকদের মধ্যে জীবিকা হারানো এবং বাস্তুচ্যুতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যদিও বনাঞ্চল ধ্বংস করেই সেখানে মানুষের পদচারণ এবং কৃষিসহ নানা কর্মকাণ্ড তৈরি হয়েছে। সন্তোষপুর বনাঞ্চলকে কেন্দ্র করে বছরের পর বছর ধরে একটি বিশাল স্থানীয় কৃষি অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন ও কৃষি বনায়ন কর্মসূচির আওতায় প্রায় দেড় হাজার পরিবার সরাসরি যুক্ত। আনারস, হলুদ, কলা ও লেবু চাষের মাধ্যমে এই বনাঞ্চল ঘিরে বছরে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ইকোপার্কের সীমানাপ্রাচীর, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার বা পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে এই কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রা থমকে যেতে পারে বলে দুশ্চিন্তায় আছেন সেখানকার মানুষেরা।

উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার এই উদ্যোগ সফল করতে হলে রাষ্ট্রকে পরিবেশগত সুফলের পাশাপাশি মানুষের বাঁচুমরার সুরক্ষাকে সমান প্রাধান্য দিতে হবে। আমরা আশা করব ইকোপার্কটি পরিবেশবান্ধব ও কৃষিবান্ধবভাবে গড়ে তোলা হবে। কেবল পর্যটনকেন্দ্রিক বা ইট-

সম্প্রতি এই বনাঞ্চলকে ইকোপার্ক ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বনাঞ্চলটি সংরক্ষণ প্রক্রিয়া টেকসই হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্প্রতি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের অধীনে এই বনাঞ্চলের ৫৬৫ একর এলাকাকে 'ইকোপার্ক' হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিলুপ্তপ্রায় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারে সরকারের এই সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে প্রশংসনীয় হলেও প্রকল্পটিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অধিবাসী ও কৃষকদের মধ্যে জীবিকা হারানো এবং বাস্তুচ্যুতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যদিও বনাঞ্চল ধ্বংস করেই সেখানে মানুষের পদচারণ এবং....

নতুন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলের প্রেসিডেন্সি কেমন হবে

সালেহ উদ্দিন আহমদ
শিক্ষক, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

যেমন আশা করা হয়েছিল, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কেউ আশ্চর্যও হননি। নির্বাচনের পর থেকেই বারবার তাঁর নাম উঠে আসছিল বিএনপির মনোনীত রাষ্ট্রপতি হিসেবে।

আমাদের দেশে যেহেতু দলের বাইরে বিশিষ্ট কাউকে রাষ্ট্রপতি করার প্রচলন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই বিএনপি দলেরই কেউ রাষ্ট্রপতি হবেন, সেটা ছিল সবার জানা।

বিএনপির বাইরেও বিপুল জনগণের কাছে মির্জা ফখরুল ইসলামকে একজন সজ্জন ও সম্মানীত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট পদের সব কাজই খুব আনুষ্ঠানিক ও রুটিনমাফিক চলে, তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে ও সংকটকালে রাষ্ট্রপতিকে অনেক বড় দায়িত্ব নিতে হয় এবং দল ও মতের ঊর্ধ্বে উঠে সংকট সামাল দিতে হয়। বাংলাদেশে আমরা অনেকবার এ পরিস্থিতি দেখেছি। আমরা আশা করব, মির্জা ফখরুল ইসলামকে তাঁর দায়িত্বকালীন অবস্থায় তেমন কোনো সংকট মোকাবিলা করতে হবে না, দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকবে এবং তিনি নির্বিঘ্নে রুটিনমাফিক কাজের মাধ্যমে তাঁর কার্যকাল সম্পন্ন করতে পারবেন।

প্রশ্ন আসতে পারে, রাষ্ট্রপতির রুটিন দায়িত্ব কী? আমরা বিগত দিনে যা দেখেছি, তার ভিত্তিতে কিছুটা অনুমান করতে পারি। প্রতিবছর অন্তত একবার এবং নতুন সংসদ নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দেবেন। অবশ্য এই ভাষণ তাঁকে সরকারের দপ্তর থেকে লিখে দেওয়া হবে, তিনি শুধু কষ্ট করে পড়বেন।

কোনো নতুন বিদেশি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ পেলে, তাঁকে প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করতে হয়। রাষ্ট্রপতিকে বাধ্যতামূলকভাবে এই পরিচয় গ্রহণ করতে হয়, নাকচ করার কোনো উপায় নেই।

বিভিন্ন জাতীয় দিবসে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব বেড়ে যায়, তাঁকে শহীদ মিনার বা জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে ফুলের তোড়া দিতে হয়। তা ছাড়া জাতীয় দিবসগুলোতে রাষ্ট্রপতিকে বাণী প্রচার করতে হয়। রাষ্ট্রপতি মাঝেমধ্যে বিদেশভ্রমণেরও সুযোগ পান, বিশেষত যখন কোনো বিদেশি সরকারপ্রধান মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর শেষকৃত্যে অংশ নেওয়ার জন্য।

তা ছাড়া বাংলাদেশে একটা নিয়ম হয়ে গেছে, রাষ্ট্রপতি প্রতি ছয় মাস বা এক বছর পর পর চিকিৎসা করতে বিদেশে যাবেন। আওয়ামী লীগ আমলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বিরাটসংখ্যক লোকের লটবহর নিয়ে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। মির্জা ফখরুলের বিদেশসঙ্গী কতজন হবেন, তা পর্যবেক্ষকেরা নিশ্চয় লক্ষ রাখবেন।

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম বড় প্রটোকলের মানুষ নন। অহংবোধ বা ইগো দেখানোর লোকও তিনি নন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে তিনি সরকার ও দলের নেতাদের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখবেন, সেটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিএনপিতে তাঁর শুভার্থীর সংখ্যাও কম নয়। তিনি নিশ্চয়ই রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব মেনে এ পদের প্রটোকলও বজায় রাখবেন।

প্রধানমন্ত্রী বা সরকারপ্রধান যখন বিদেশ সফর করে আসেন, তখন তাঁকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদেশ সফরের ফলাফল জানাতে হয়। তবে জুলাইপরবর্তীকালে নানা কারণে এ প্রটোকলের বিঘ্ন ঘটেছে। আশা করা যায়, সেই সৌজন্য আবার ফিরে আসবে।

তবে রাষ্ট্রপতির সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, সংসদ যেসব বিল পাস করবে, রাষ্ট্রপতিকে সেগুলোতে সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর দিতে হয়। অবশ্য বাংলাদেশের সংবিধানের ৮০ ধারা মতে সংসদে গৃহীত একটা বিল রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর না করে সংসদে পুনর্বিবেচনার জন্যও পাঠাতে পারেন। তবে বাংলাদেশে সাধারণত কোনো রাষ্ট্রপতিই সেই ঝুঁকি নেন না। রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম কি সে ধরনের কোনো ঝুঁকি নেবেন, কোনো বিল তাঁর অপছন্দ হলে তিনি কি তাতে অসম্মতি জানিয়ে ফেরত পাঠাবেন? এমন সম্ভাবনা খুব কম, তবে একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিচ্ছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম বিএনপির মহাসচিব হিসেবে অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতির রুটিন কাজগুলো সামলানো তাঁর জন্য কঠিন কিছু হবে না। আল্লাহ না করুক, দেশের কোনো রকম দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় কোনো সংকট সামাল দিতে হলে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে তা দক্ষতার সঙ্গে পারবেন, জাতি তাঁর ওপর সে আস্থা রাখতেই পারে।

তবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন যত নিষ্কণ্টক মনে করা হয়, তত নিষ্কণ্টক নয়। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর সাধারণত সরকারি দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর আস্তে আস্তে দূরত্ব তৈরি হয়। রাষ্ট্রপতি প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভবনে বন্দী থাকেন। রাজনীতির গতিপ্রকৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তাঁর থাকে না। রাষ্ট্রপতিকে কতগুলো প্রটোকল মেনে চলতে হয়। তাই তিনি কোনো দলীয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তিনি দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। সরকারপ্রধানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ সীমিত ও আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়ে। এসব থেকে অনেক সময় ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কি সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য

বিএনপির আরেকজন মহাসচিব রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রপতি পদে পূর্ণ মেয়াদ থাকতে পারেননি, তার আগেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অসহায়ভাবে অপসারণের উদাহরণ থেকে ধারণা করা যেতে পারে, বঙ্গভবনে গিয়ে একজন রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিকভাবে কতটা অসহায় হয়ে পড়েন।

বিএনপির আরেকজন রাষ্ট্রপতিকে যথেষ্ট বিড়ম্বনা সইতে হয়েছিল। ওয়ানুইলেভেনের সময় দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমদ। জেনারেল মঈন ক্ষমতা দখলের পর তাঁকে সেনাবাহিনীর কথা অনুসারে চলতে হয়েছিল। এ জন্য তিনি দারুণভাবে বিএনপির বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ২০০৯ সালে পদত্যাগ করার পর তাঁকে নিভৃতেই অবসরজীবন কাটাতে হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম বড় প্রটোকলের মানুষ নন। অহংবোধ বা ইগো দেখানোর লোকও তিনি নন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে তিনি সরকার ও দলের নেতাদের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখবেন, সেটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিএনপিতে তাঁর শুভার্থীর সংখ্যাও কম নয়। তিনি নিশ্চয়ই রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব মেনে এ পদের প্রটোকলও বজায় রাখবেন।

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পরামর্শ ও তথ্য পাওয়ার এবং তাঁকে সতর্ক করার সাংবিধানিক অধিকার রাষ্ট্রপতির রয়েছে। তবে তা হতে হবে একান্ত ব্যক্তিগতভাবে। মির্জা ফখরুল রাজনীতির লোক। তিনি কি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দেবেন? সেটা একান্তই তাঁদের দুজনের ব্যাপার। সাধারণ জনগণের কৌতূহল থাকলেও এসব আলোচনা সম্ভবত কখনো উন্মুক্ত করা হবে না। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির কার্যবিধি ও ক্ষমতা খুবই সীমিত এবং দারুণভাবে আনুষ্ঠানিক পরিসরে আবদ্ধ। তাই মির্জা ফখরুল ইসলাম বঙ্গভবনে যাওয়াতে আমরা দেশের নীতিনির্ধারণ বা শাসনব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন দেখব না। তবে জুলাইপরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ আমলে নির্বাচিত ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে নিয়ে যে একটা জটলা ও অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়েছিল, নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে তার অবসান হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নিয়ে জাতি আশান্বিত

সালাহউদ্দিন বাবর
সম্পাদক, নয়া দিগন্ত

মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূল চেতনা ছিল গণতন্ত্র, জনগণের অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশকে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্র এবং মন্ত্রিসভা সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, এটা ছিল সাংবিধানিক কাঠামোর মূল দর্শন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত করা হয়। একই সাথে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়, যা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা কখনো সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি।

বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থার অবসান ঘটে। ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুনরায় সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় ফিরে আসে।

অতএব, বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস শুধু সাংবিধানিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ইতিহাস নয়; এটি রাষ্ট্রক্ষমতার ভারসাম্য, জনগণের সার্বভৌমত্ব, সংসদের মর্যাদা এবং নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস। এ অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দেয়, শুধু সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধান থাকলে গণতন্ত্র কার্যকর হয় না। প্রয়োজন শক্তিশালী সংসদ, স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, কার্যকর বিরোধী দল, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন এবং জনগণের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতার জবাবদিহি।

দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ পর্যালোচনা করলে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি ও বাস্তব চর্চার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষণীয়। সংসদীয় ব্যবস্থার প্রকৃত সাফল্য শুধু নিয়মিত সংসদ বসা, আইন পাস করা কিংবা বাজেট অনুমোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মূল মাপকাঠি হলো, নির্বাচন কতটা প্রতিযোগিতামূলক, বিরোধী দলের উপস্থিতি কতটা কার্যকর, সরকার কতটা জবাবদিহির আওতায় থাকে, সংসদীয় কমিটিগুলো কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং জনগণের মতামত ও অধিকার রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে কতটা প্রতিফলিত হয়।

দশম জাতীয় সংসদ : ২৯ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করা এ সংসদের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল ২০১৪ সালের নির্বাচন ঘিরে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি-সহ বিরোধী জোটের নির্বাচন বর্জন। ফলে সংসদে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের আধিপত্য অত্যন্ত প্রবল হয়। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন দুর্বল হয়ে পড়ে। বিরোধী দলের কার্যকর উপস্থিতি না থাকায় সংসদের জবাবদিহিমূলক ভূমিকা সীমিত ছিল।

ওই সংসদকে বলা হতো, ভোটারবিহীন সংসদ। দশম সংসদ গঠন প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল না।

একাদশ জাতীয় সংসদ : ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত এ সংসদ ২০১৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে। আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বিএনপি ও তার মিত্রদের অংশগ্রহণ থাকলেও নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দেশ-বিদেশে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অনিয়ম, ভোট কারচুপি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের অভিযোগে নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তবে দশম সংসদের তুলনায় একটি পার্থক্য ছিল, বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত থেকে সংসদীয় কার্যক্রমে অংশ নেয়; কিন্তু সংখ্যাগত ভারসাম্য এতটাই অসম ছিল যে, সরকারের সিদ্ধান্তকে কার্যকরভাবে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা বিরোধী দলের সীমিত ছিল। ওই সংসদকে অবহিত করা হতো রাতের ভোটের সংসদ। তাই দেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সেটির কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ : ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও জামায়াত বর্জন করে। ফলে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিসর ব্যাপকভাবে সঙ্কুচিত হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশও কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য মুক্ত, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। এ সংসদে জাতীয় পার্টি মাত্র ১১টি আসন পায়। ৬২ জন স্বতন্ত্র সদস্য নির্বাচিত হন। শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। মাত্র ছয় মাস স্থায়ী এ সংসদ সাংবিধানিকভাবে কার্যকর হলেও গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার গভীরতার প্রশ্নে দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল। উপরোক্ত সংসদের একটি বড় সমালোচনা হলো– সংসদীয় জবাবদিহির পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের প্রশস্তি অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এ সংসদে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধী দল ছিল না। ওই সংসদকে আমি-ডামির সংসদ বলে বিশেষায়িত করা হয়েছিল।

প্রথম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সংসদ সংসদীয় গণতন্ত্রকে অকার্যকর করেছে। প্রথম, দশম, একাদশতম এবং দ্বাদশ সংসদ এই চারটি সংসদের কার্যক্রম পরিচালনায় মোট ৫৯টি অধিবেশনে রাষ্ট্রের প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এ বিপুল অর্থ অপচয়ের কোনো যৌক্তিকতা ছিল না।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন : ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের পর ১২ মার্চ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ৩০ এপ্রিল শেষ হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ৭ জুন।

১৫ জুলাই শেষ হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনটি ছিল ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন। দু'টি অধিবেশনে নতুন সংসদ নিজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন, পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা অধ্যাদেশের নিষ্পত্তি, আইনপ্রণয়ন, বাজেট আলোচনা, মন্ত্রীদের জবাবদিহি এবং সংসদীয় কমিটি সক্রিয় করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তবে সংসদকে আরো কার্যকর, অংশগ্রহণমূলক ও জনমুখী করার সুযোগ এখনো আছে। প্রথম অধিবেশন : প্রথম অধিবেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা অধ্যাদেশগুলোর সংসদীয় নিষ্পত্তি। মোট ১৩৩টি অধ্যাদেশ সংসদের সামনে উপস্থাপিত হয়। এর মধ্যে ৯৪টি বিল পাস করা হয়। ২৫ কার্যদিবসে ৯৪টি বিল পাস করা সংসদের আইনপ্রণয়ন সক্ষমতার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

তবে এত বিপুলসংখ্যক অধ্যাদেশ ও আইন স্বল্প সময়ে নিষ্পত্তিতে সংসদীয় পর্যালোচনার গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। শুধু সংখ্যাগত সাফল্য নয়, প্রতিটি আইনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক প্রভাব যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা জরুরি। প্রথম অধিবেশন : প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ২৮০ জন সংসদ সদস্য আলোচনা করেন। সাতটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়, যার মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী ও দু'টি বিশেষ কমিটি ছিল। নতুন সংসদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ছিল, এটি যেন শুধু আইন পাসের প্রতিষ্ঠান না হয়ে সরকারের কর্মকাণ্ডের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় অধিবেশন ও বাজেট : ৭ জুন শুরু হওয়া দ্বিতীয় অধিবেশন ছিল সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন। মোট ২৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১১ জুন অর্থমন্ত্রী বাজেট উপস্থাপন করেন। ৩০ জুন বাজেট পাস হয়। বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় ৩১৬ জন সংসদ সদস্য অংশ নেন। মোট ৪৮ ঘণ্টা ৫১ মিনিট আলোচনা হয়। এত বিপুলসংখ্যক সদস্যের অংশগ্রহণ ইতিবাচক। তবে বাজেট আলোচনায় সরকারের ব্যয়, রাজস্বনীতি, ঋণ, মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আঞ্চলিক বৈষম্যের মতো বিষয়গুলো কতটা তথ্যভিত্তিকভাবে আলোচিত হয়েছে, তাও গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রীদের কাছে পাঁচার হাজার ৩১টি প্রশ্ন জমা দেয়া হয়।

তিন হাজার ৪৭৪টির উত্তর দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে ২৭৮টি প্রশ্ন জমা পড়ে, যার মধ্যে ৩৫টির উত্তর লিখিতভাবে দেয়া হয়। প্রশ্নের সংখ্যা সংসদ সদস্যদের সক্রিয়তার পরিচায়ক হলেও এর গুণগত মান আরো গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের বাস্তব সমস্যা, সরকারি প্রকল্পের অনিয়ম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আইনশৃঙ্খলা, দ্রব্যমূল্য, নদীভাঙন, অবকাঠামো ও প্রশাসনিক দুর্বলতা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কতটা সরকারের নজরে আনা হয়েছে, তা ভবিষ্যৎ মূল্যায়নে গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ৭১৫টি নোটিশ দাখিল করা হয়; এর মধ্যে ২৪টি গ্রহণ এবং ২২টি নিয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া ১২৫টি দুই মিনিটের নোটিশ নিয়ে আলোচনা এবং চারটি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়। সংসদীয় আলোচনা আরো ফলপ্রসূ করতে হলে দলীয় রাজনৈতিক বক্তব্যের পাশাপাশি তথ্য, গবেষণা, পরিসংখ্যান ও জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিষয় উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ১১টি স্থায়ী ও বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে সংবিধান সংশোধনসংক্রান্ত বিশেষ কমিটিও ছিল। সংসদীয় কমিটি মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে। এসব কমিটি নিয়মিত বৈঠক করে সরকারি ব্যয়, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অনিয়ম, দুর্নীতি ও নীতিগত ব্যর্থতা নিয়ে অনুসন্ধান এবং সুপারিশ বাস্তবায়নের ওপর নজর রাখলে সংসদের জবাবদিহিমূলক ভূমিকা আরো শক্তিশালী হবে।

সামগ্রিকভাবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে কয়েকটি ইতিবাচক দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দ্রুত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন, বিপুলসংখ্যক অধ্যাদেশ ও আইন সংসদীয় প্রক্রিয়ায় আনা, বাজেট আলোচনায় ব্যাপক অংশগ্রহণ, মন্ত্রীদের কাছে বিপুলসংখ্যক প্রশ্ন এবং সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম শুরু করা। তবে আইন পাসের গতি যেন পর্যালোচনার গভীরতা ছাপিয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। বিরোধী মত ও সমালোচনার পর্যাপ্ত সংসদীয় পরিসর এবং তথ্যভিত্তিক বিতর্ক নিশ্চিত করাও জরুরি।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনকে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে শক্তিশালী সংসদীয় কমিটি, কার্যকর প্রশ্নোত্তর, বিরোধী মতের যথাযথ সুযোগ এবং জনগণের বাস্তব সমস্যার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হলে এ সংসদ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে আরো শক্তিশালী করতে সক্ষম হবে। মনে রাখতে হবে, ত্রয়োদশ সংসদের প্রায় ৭৬ শতাংশ সদস্য প্রথমবার নির্বাচিত হয়েছেন। তাই তাদের কাছ থেকে অতীতে অভিজ্ঞদের মতো পরিপক্ব সংসদীয় ভূমিকা পালনের আশা করা বাস্তবসম্মত নয়। গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। তবে এ সংসদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্যক্রম বিবেচনায় নেয়া হলে এটা পরিষ্কার যে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ জাতির জন্য আশাজাগানিয়া হতে পারে।

শেষ কথা হলো, যেকোনো সংসদ কার্যকর ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তখন, যখন সংসদ নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেতা, চিফ হুইপ যথাযথ ভূমিকা পালন করেন। ত্রয়োদশ সংসদের সংসদ নেতার পদে তারেক রহমান নবীন। স্পিকার হাফিজউদ্দিন স্বপদে নবীন। বিরোধী দলের নেতা ডা: শফিকুর রহমানও প্রথমবারের মতো সংসদে এসেছেন। উল্লেখ করার বিষয় হচ্ছে, তিনজনই নবীনত্বের বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে এসে সংসদকে কার্যকর এবং প্রাণবন্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। সংসদের চিফ হুইপ অভিজ্ঞ সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম সংসদের গতিশীলতা ঠিক রাখতে অবদান রাখছেন।